প্রতিবেদন ৯১

শিল্পে কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা: আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই?

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, রোড ১১
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০ ২) ৯১৪৫০৯০, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩
ফ্যাক্স: (৮৮০ ২) ৮১৩০৯৫১
E-mail: cpd@bdonline.com
Website: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৭
স্বত্ব © সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মূল্য টাকা ৪০.০০

ISSN 1818-1570 (Print)
ISSN 1818-1597 (Online)

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হল একটি জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজনসহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার স্বপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারকবৃন্দ, সরকারি আমলা, উন্নয়ন-অংশীদারসহ বিশেষজ্ঞগণ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রুপসমূহকে নিয়ে নিয়মিত নীতি-সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডি'র লক্ষ্য হল এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। এ গবেষণাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা (আই.আর.বি.ডি.) অন্যতম। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চলমান গবেষণা কর্মসমূহের মধ্যে আছে বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ.টি.ও) - এর প্রভাব পরিবীক্ষণ, দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ ও উদ্যোগের প্রসার, সুশাসন ও উন্নয়ন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি। এসব গবেষণা সিপিডি'র সংলাপ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধতর করছে। সিপিডি'র অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে নীতি ইস্যু ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে জনমত জরিপ পরিচালনা এবং নবীন/তরুণদের নেতৃত্বদান।

সিপিডি'র গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সিপিডি'র একটি সক্রিয় প্রকাশনা কর্মসূচিও (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিডি নিয়মিতভাবে 'সিপিডি সংলাপ প্রতিবেদন সিরিজ' (CPD Dialogue Report Series) প্রকাশ করে থাকে।

বর্তমান প্রতিবেদনটি ***শিল্পে কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা: আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই?*** শীর্ষক সংলাপের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সংলাপটি ৬ মার্চ ২০০৬ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন: *জনাব দেওয়ান হানিফ মাহমুদ*, সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো
সহকারী সম্পাদক: *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, প্রধান, ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগ
সিরিজ সম্পাদক: *অধ্যাপক রেহমান সোবহান*, চেয়ারম্যান, সিপিডি

সংলাপ প্রতিবেদন

শিল্পে কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা: আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই?

সংলাপ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বাংলাদেশের 'শিল্পে কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা: আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই?' শীর্ষক এক সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপটি ৬ মার্চ ২০০৬ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সিপিডি-র চেয়ারম্যান *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* এর সভাপতিত্বে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*। সংলাপে তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে যুক্ত মালিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংলাপে এই শিল্পের আইনগত ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত তুলে ধরতে দেশের খ্যাতনামা আইনজীবী ও শ্রম বিশেষজ্ঞরাও অংশ নেন।

সূচনা বক্তব্য

সংলাপের সূচনা বক্তব্য দেন সিপিডি-র নির্বাহী পরিচালক *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*। তিনি পোশাক শিল্পের সাথে সরাসরি যুক্ত মালিক, শ্রমিক ও সরকার এই তিন পক্ষের ভূমিকা বর্ণনা করে নতুন পক্ষ হিসাবে সুশীল সমাজের যুক্ততার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পোশাক শিল্পের কর্ম পরিবেশের নানা রকম সমস্যা চিহ্নিত করে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

ড. ভট্টাচার্য সোনার হাঁসের গল্পের অবতারণা করে এই সোনার হাঁসকে গার্মেন্টস শিল্পের সঙ্গে তুলনা করেন। তার মতে দেশের প্রধান রপ্তানি খাত বা গার্মেন্টস নামক সোনার হাঁসকে যদি জবাই করে ফেলা হয় তাহলে আর আগামীতে কে ডিম পাবে, সেটা দেশ এবং জাতির কাছে অনুধাবনযোগ্য। তাই সোনার হাঁস বাঁচাতে দেশের আইনগত কাঠামো যা আছে সেটাকে শক্তিশালী করতে হবে। শিল্পে কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন তৈরি করার উপর জোর দেন তিনি। এই আইন যদি তৈরি করা হয় তাহলে তা সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের ত্রিপক্ষীয়ভাবে সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। সাথে সাথে মালিকদের পক্ষ থেকে সাধারণ আচরণবিধি তৈরি করা এবং শ্রমিকদের জন্য তাদের সংগঠন করার অধিকারের ভিত্তিতে কর্মপরিবেশের পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে বলে তিনি অভিমত দেন।

গার্মেন্টস শিল্পের সমস্যা সমাধানে নাগরিকরা কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে সে প্রশ্ন তুলেন *ড. ভট্টাচার্য*। এই শিল্পকে দেশের জাতীয় উন্নতি এবং রপ্তানির সাথে যুক্ত এবং এ শিল্প রক্ষায় যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার উপর জোর দিয়ে গার্মেন্টস কারখানার পরিবেশ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন।

কারখানার পরিবেশ

ড. ভট্টাচার্য দেশের বেশিরভাগ গার্মেন্টস কারখানার কর্ম পরিবেশের করুণ চিত্র তুলে ধরে উন্নত বিশ্বের বাস্তবতার

সাথে তুলনা করেন। কমপ্লায়েন্স না থাকা ও কিছু দিন পর পর দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, কারখানাগুলোতে বর্তমানে যে পরিস্থিতি রয়েছে একে আমরা অনেকেই জরুরি অবস্থা হিসেবে ধরে নিয়ে মোকাবেলার চেষ্টা করি। কিন্তু উন্নত বিশ্বে এটাকে প্রতিষেধক হিসাবে দেখা হয়। অর্থাৎ এ জাতীয় দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে মনোযোগ বেশি থাকে। সে লক্ষ্যেই আইন এবং প্রবিধানগুলোকে দাঁড় করানো হয়। হলে পরে কী হবে তা বিবেচনা না করে, যাতে এমন পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেটাই বিবেচ্য। কারখানা গুলোতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া বা পরবর্তীতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন বা দেশের শ্রম আইনের ভেতর যে বিধান গুলো রয়েছে তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, বিদ্যমান আইন গুলো কতখানি পরিপালিত হচ্ছে তার উপর বেশি জোর দিতে হবে।

কারখানা গুলোতে শ্রমিকের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ টেনে *ড. ভট্টাচার্য* বলেন, একজন শ্রমিকের কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা দেয়া এবং তার স্বাস্থ্যের যেন কোনো ক্ষতি না হয় তা দেখার দায়িত্ব মালিকের। কোনো মেশিন চালাতে গেলে যদি শ্রমিকের বিপদের আশঙ্কা থাকে সেটা সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দেয়া মালিকের ও সুপারভাইজারের দায়িত্ব। এ ধরনের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা ঠিক মতো নেয়া হয় কী-না সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি বলেন, একাজে খুব বড় ধরনের বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র সদিচ্ছা, মনোযোগ ও সচেতন চর্চার মাধ্যমে এসব অনেক সমস্যারই সমাধান করা যায়। কারখানায় শ্রমের সুষ্ঠু পরিবেশ বা কমপ্লায়েন্স থাকার ব্যাপারে সাম্প্রতিককালে বিদেশী ক্রেতারা যে শর্ত দিচ্ছে সে প্রসঙ্গের উপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, এধরনের চাপের মুখে বাংলাদেশে অনেক বড় বড় আধুনিক কারখানা গড়ে উঠেছে যেখানে শ্রমের সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে। কিন্তু এ অভিযোগও উঠছে যে এই কারখানাগুলোর পিছনে আরো একটা কারখানা থাকে, যেখানে অপেক্ষাকৃত খারাপ পরিবেশে শ্রমিকরা কাজ করছে। এই যদি পরিস্থিতি হয় এবং সেটা যদি সত্য হয় ও ধরা পড়ে তাহলে জাতীয় রপ্তানির ক্ষেত্রে গড়ে উঠা ভাবমূর্তি বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা: মৃতের সঠিক হিসাব নেই

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্পে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সময়ের দুর্ঘটনা ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরেন। ৯০-এর দশকের শুরুতে *সারাকা গার্মেন্টের* দুর্ঘটনায় ২৯ জন শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনাকে সূত্রপাত হিসেবে মন্তব্য করে একে একে আরো ১০টি দুর্ঘটনা তুলে ধরেন তিনি। যেখানে নিহতের সংখ্যা ডবল ডিজিটের নিচে না নেমে উল্টো বেড়েছে। তিনি জানান, ১৯৯৫ সালে বিভিন্ন কারখানা মিলিয়ে ১০ জন, ৯৬ সালে ২৮ জন, ৯৭ সালে সাংহাই অ্যাপারেলস-এ ২৪ জন, '৯৮ সালে ৬টি বিভিন্ন কারখানা মিলিয়ে প্রায় ১৯ জন, ২০০০ সালে দুটি কারখানা মিলিয়ে ৬০ জন মারা গেছে। এদের প্রত্যেকের সাথে কিন্তু একশ'-দুইশ' জন করে আহতের হিসাব আছে। ২০০১ সালে ৫টি বিভিন্ন গার্মেন্টসে মারা গেছে ৪৫ জন, ২০০৫ সালে দুটি কারখানাতে মারা গেছে ৮৩ জন। কিছুদিন আগে স্পেকট্রাম গার্মেন্টসে ৭৭ জন মারা গেছে। এই হিসেবে সব মিলিয়ে কম করে হলেও তিনশ' থেকে সাড়ে তিনশ' জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং আরো ৩ হাজার শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ড. *ভট্টাচার্য* মৃত্যু ও হতাহতের সংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান নেই এই অভিযোগ করে বলেন, অনেক সময় লাশ সরিয়ে ফেলা হয়। একটা বড় অংশ নিখোঁজ হয়ে যায়। ফলে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা জানা যায় না। এই আলোচনার মূল প্রশ্ন হিসেবে তিনি দুর্ঘটনায় কত লোক আহত বা হত হয়ে জীবন দিচ্ছে, কত লোক সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হচ্ছেন তার কোন সঠিক তথ্য উপাত্ত নেই বলে তিনি অভিযোগ তুলেন। আহত ও নিহতের সংখ্যার হিসেব রাখার দায়িত্ব মালিকপক্ষ, না সরকারের শিল্প সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সে প্রশ্ন তুলেন তিনি। বার বার পত্রিকার পাতা খুঁজে এই সংখ্যা কেন বের করতে হবে বা লাশ সরিয়ে ফেলার এই প্রবণতা কেন তা নিয়েও তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেন।

কেন বারবার দুর্ঘটনা?

ড. *ভট্টাচার্য* কারখানা গুলোতে দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে কিছু মৌলিক প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। কারখানা গুলোতে জরুরি নির্গমনের পথ সরু এবং বেশির ভাগ সময় সেখানে কারখানার মালামাল স্তুপিকৃত অবস্থায় থাকে। বাক্স বা অন্যান্য মালামাল দিয়ে বন্ধ থাকা সেই রাস্তার কলাপসিবল গেটও অনেক সময় থাকে বন্ধ। ফলে আগুন লাগা বা বিস্ফোরণের সময় শ্রমিকরা তাড়াহুড়ো করে সরু পথ দিয়ে নামার সময় একজনের পায়ের নিচে পড়ে অন্যজন মারা যায়। অনেক বড় প্রতিষ্ঠানেও জরুরি প্রয়োজনে যথোপযুক্ত নির্গমনের ব্যবস্থা নাই। যেখানে নূন্যতম দুটো সিঁড়ি থাকার কথা, অনেক কারখানাতে তা নেই বলে তিনি অভিযোগ করেন। এনিয়ে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল তুলে ধরে তিনি দেখান ৩০ থেকে ৪০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের ভেতরে জরুরি নির্গমনের কোন রাস্তা নেই।

কারখানা চলাকালীন সময়ে কলাসিবল গেট কেন বন্ধ থাকে সে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই মালিকদের পরামর্শে গার্ডরা লুটপাটের ভয়ে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক বা বুঝতে না পেরে হোক রাস্তা বন্ধ রাখে। দুর্ঘটনার সময় অনেকে রাস্তা খুজে না পেয়ে উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আহত হচ্ছেন বা মারা যাচ্ছেন।

অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, একদিকে অনেক কারখানায় অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র নেই অন্যদিকে থাকলেও সেগুলো ঠিকমতো কাজ করে না। পাশাপাশি এগুলো চালানো সম্বন্ধে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। এমনকি বছরে বা ছয় মাসে একবার যে নিয়মিত মহড়া হওয়ার কথা সেটিও হয় না। দুর্ঘটনার সময় এলার্ম বাজানোর যে প্রশিক্ষণ সেটাও দেয়া হয়না। এমন কি ঐ এলার্ম এবং ফায়ার হোয়েষ্ট ঠিকমতো কাজ করে না।

দুর্ঘটনার পরে একটি সাধারণ চিত্র হচ্ছে ঘটনার দায় এড়ানো নিয়ে বিভিন্ন তৎপরতা। ড. *ভট্টাচার্য* তাঁর আলোচনায় বলেন, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সবসময় একই রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় যেখানে মালিকপক্ষের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে দৌড়ে যান এবং মালিক নিজে পালিয়ে যান। তখন মালিক নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে আপস-রফার আলোচনা শুরু হয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে মালিক কোনো না কোনোভাবে উদয় হন। তিনি আগাম জামিন পান বা জামিনের ব্যবস্থা হলে পরেই নিরাপত্তা নিয়ে বাইরে আসেন। তখন গার্ডসহ খুব সাধারণ কর্মচারীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ প্রকৃত দোষীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনায় দোষী হিসাবে মালিককে শাস্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত নেই বলে তিনি জানান। পরবর্তীতে নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে খুব সাধারণ একটি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়। সেটা খুব বেশি হলে এক লাখ টাকা হতে পারে। অন্যদিকে কার কতখানি গ্রুপ ইন্সুরেন্স

ছিল, এই টাকার পরিমাণ কত ছিলো, শ্রমিক মারা গেলে কত পাবে–সে সম্বন্ধে শ্রমিকদের কোনো সাধারণ জ্ঞান নেই। তাদেরকে আগে থেকে বলাও হয় না। এগুলো সম্পর্কে কোনো প্রচার থাকে না। যার ফলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শ্রমিকদের যে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা তা তারা কখনো পায়না। অভিযোগ এনে তিনি বলেন, শ্রমিকরা যেটা পান সেটা হলো দয়া-দাক্ষিণ্যের অংশ হিসেবে। এটা তাদের অধিকারের বাইরের একটা অংশ। একথার সাথে তিনি আরো উল্লেখ করেন, দুর্ঘটনার বিষয়ে সরকার একটা কমিটি করে, মালিকরা আরেকটা কমিটি করে। তারপর সেটার উপরে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবনা আসে। সেখানে বিল্ডিং কোড থেকে আরম্ভ করে যে বিল্ডিং-এ শিল্পটি আছে সেখানে কী কী নিয়ম বরখেলাপ করা হয়েছে, প্রশাসনের কী কী অসুবিধা ছিল এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কী কী সমস্যা ছিলো– এইগুলো আসে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে এর কার্যকারণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়না বলে *ড. ভট্টাচার্য* অভিযোগের সুরে মন্তব্য করেন।

সেকেলে আইনে চলছে কারখানা

যে আইনগুলোর ভিত্তিতে কারাখানা চলছে তা যথোপযুক্ত, আধুনিক, হালনাগাদ কি না এবং এগুলোর দুর্বলতার কারণেই বর্তমানে আমরা এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি কি না সে প্রশ্ন তোলেন *ড. ভট্টাচার্য*। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন কারাখানা চলে ১৯৬৫ সালের তৈরি ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট ও ১৯৭৯ সালের ফ্যাক্টরি রুলে। কিন্তু গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ হয়েছে আরো পরে। তবে যে আইনগুলো আছে সেগুলোরও খুব একটা প্রয়োগ দেখা যায় না। এছাড়া ১৯২৩ সালের ওয়ার্কার্স কমপেনসেশন এ্যাক্ট রয়েছে যার অধীনে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা ছিলো। তবে এর প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের ব্যাপারে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায়না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় বা আগুনে পুড়ে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ কোনো আইন আমাদের দেশে নেই, একারণে বড় ধরনের কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করা যাচ্ছেনা বলে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যে ব্যাখ্যা দেন তা সত্য নয় বলে উল্লেখ করে *ড. ভট্টাচার্য* বলেন, আইনের কোনো দুর্বলতা আছে কি না, আইনগুলোকে আধুনিক করার প্রয়োজন আছে কি না- তা খতিয়ে দেখা দরকার। এবং সর্বোপরি বিদ্যমান আইনগুলো ঠিকমতো বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

দেশের বিদ্যমান আইনের নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে *ড. ভট্টাচার্য* শ্রম মন্ত্রণালয়, কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার ব্রিগেড, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তৈরি পোষাকের একটি বড় অংশ রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করাতে এবং পরবর্তীতে তা কার্যকরভাবে ধরে রাখতে কতটুকু সক্ষম তা ভেবে দেখার জন্য তাগিদ দেন। *ড. ভট্টাচার্য* কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষে ৪ হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান মাত্র ৪৭ জন পরিদর্শক দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান গুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, পরিদর্শকরা কারখানাগুলোর প্রকৃত পরিস্থিতি বিবেচনা করার মতো ক্ষমতা রাখেন না। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু অনিয়মের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, পরিদর্শকরা প্রকৃত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কারখানাগুলোর সার্টিফিকেট দেয় না। বিভিন্ন চাপের মুখে ঘরে বসেও

অনেক সময় সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। ফলে শেষ পর্যন্ত ঐ প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকদের জীবন এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় ক্ষতি হচ্ছে। মালিকপক্ষ ও ব্যবসায়িক সংগঠন গুলো যথার্থ ভূমিকা রাখছে কিনা সে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের নিজেদের কোন কোড অব কন্ডাক্ট আছে কিনা, যার মাধ্যমে তাদের কোনো অভিযুক্ত সদস্যকে সাথে সাথে বহিষ্কার করা যাবে অথবা ওই আচরণবিধি পরিপূর্ণ হলেই সদস্যপদ দেওয়া হবে।

ড. *ভট্টাচার্য* বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাগুলো তুলে ধরে সংলাপে সকলকে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেয়ার আহবান জানান।

মুক্ত আলোচনা

জীবনের চেয়ে কাপড়ের দাম বেশি

গার্মেন্টস শ্রমিক পক্ষের *এস সাজু* বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্পের অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশে "জীবনের চাইতে কাপড়ের মূল্য বেশি"। গার্মেন্টস ব্যবসায়িদের মানসিকতার পরিবর্তন করে "কাপড়ের চাইতে জীবনের মূল্য অনেক বেশি" এই ধারণায় নিয়ে আসতে উদ্যোগ নিতে তিনি সিপিডি-র প্রতি আহবান জানান। গার্মেন্ট শিল্পে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলো বার বার ঘটায় একে দুর্ঘটনা না বলে ঘটনা বলার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সরকার মোটেই তার দায়িত্ব পালন করেনি বলে তিনি মনে করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক *নাসরিন খন্দকার* বলেন, আমাদের দেশের গার্মেন্টস মালিকরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রায়শই বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ ভারত, শ্রীলংকা, চীন, নেপাল ও ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু বিগত দুই দশকে কারখানাগুলোতে ঘটে যাওয়া অগ্নিকান্ড এবং মৃত্যুর সংখ্যাকে তারা শ্রীলংকা, চীন ও নেপালের সাথে তুলনা করেন না।

১৯৯০ সালে গাজীপুরের সায়হাম গ্রুপে তিনজন পদদলিত হয়ে মারা যাওয়া এবং তা লুকানোর বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি *মোশরেফা মিশু* বলেন, লুকানোর প্রবণতার কারণে প্রকৃত সংখ্যাটা আমরা পাচ্ছি না। দুর্ঘটনার পর অগ্নিকান্ডের সময় কত শ্রমিক মারা গেল তা কারখানা পরিদর্শক বুঝতে পারেন না। অগ্নিকান্ডের সময় কতো শ্রমিক উপস্থিত ছিলো তা একমাত্র বলতে পারবেন মালিক। যার জন্য তারা যদি এ ব্যাপারটি দুর্ঘটনার সময় প্রকৃত সংখ্যা কতো ছিলো বা প্রতিদিন কতজন শ্রমিক সেখানে কাজ করেন তা মনিটর করার ব্যবস্থা করতেন তাহলে কতজন মারা গেছেন, কত জন আহত হয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হতো। এ ধরনের পরিস্থিতি কেন হচ্ছে সে প্রশ্ন তুলে তিনি এ ব্যাপারে মালিকদের দুর্বলতাকে দায়ী করেন।

তবে বিজিএমইএ সভাপতি *এস এম ফজলুল হক* চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা সহ পোষাক শিল্প রপ্তানিকারী দেশ গুলোর তুলনায় বাংলাদেশে মৃত্যুর হার ২৫ ভাগের মতো হবে বলে দাবি করেন। এই শিল্পটা চালু রাখতে হলে দুর্ঘটনা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় মন্তব্য করে তা কমানো ও নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য

বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান। এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আইএলও ও ইউএনডিপির সহযোগিতা পেতে আলাপ-আলোচনা চলছে বলে তিনি জানান।

আইন আছে বাস্তবায়ন নেই

সংলাপে উপস্থিত শ্রম অধিদপ্তরের উপ পরিচালক *কবির আহমেদ চৌধুরী* শুরুতেই সরকারি দপ্তরের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার কথা অকপটে স্বীকার করে নেন। *ড. ভট্টাচার্যের* উপস্থাপনায় দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সে প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, নেপথ্যে আপস রফার চেষ্টা হয়। তাই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হয় নগণ্য। শ্রমিক ও তার প্রতিনিধিরা তাদের পাওনা সম্পর্কে অজ্ঞ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সবল বা দুর্বল যাই হোক শ্রম আইনটি বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তা বাস্তবায়ন করলে অনেক ক্ষেত্রে কারখানা পরিস্থিতির উত্তরণ হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট, ১৯২৩ সালের ওয়ার্কার্স কমপেনসেশন এ্যাক্ট বা অন্য যে এমপ্লয়মেন্ট অব স্ট্যান্ডিং অর্ডার এ্যাক্ট, ইন্ডাস্ট্রিজ রিলেশন অর্ডিনেন্স বা কোম্পানিজ প্রফিট ওর্য়াকার্স পার্টিসিপেশন এ্যাক্ট ১৯৬৮, ১৯৭৯ সালের ফ্যাক্টরিস রুলস এগুলো গেজেটে এখন যে অবস্থায় আছে তা ঠিকমতো প্রয়োগ করা গেলে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ১৯৬১ সালের ন্যূনতম মজুরি অধ্যাদেশ যার ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালে গার্মেন্টেসের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৯শ' ৩০ টাকা সপ্তম গ্রেডের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বারো বছর ধরে এই মজুরি ৯শ' ৩০ টাকাই ছিল। তবে এই সর্বনিম্ন মজুরি অদক্ষ সহকারী শ্রমিকদের জন্য নির্ধারণ করা।

বাংলাদেশের বিদ্যমান শ্রম আইনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি জানান, যে ৪৯টি শ্রম আইন রয়েছে যা দেশের সব শিল্পের ক্ষেত্রে সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে ২৫টি আইন বৃটিশ ভারত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, ১৪টি পাকিস্তান শাসনামল এবং বাকি ১১টি বাংলাদেশ আমলে তৈরি হওয়া। সর্বশেষ ২০০৫ সালে ১৩ই ফেব্রুয়ারি পরিবহন সেক্টরে একটি শ্রমিক কল্যাণ আইন হয়েছে। আইনের দুর্বলতার প্রসঙ্গে আলোচনায় পরিদর্শন প্রক্রিয়ার দুর্বলতা এ সংক্রান্ত বিভাগটি সক্রিয় না থাকার উপর আলোকপাত করেন। তিনি মনে করেন মামলা ও শাস্তির মাত্রা নগণ্য এবং পর্যাপ্ত জরিমানা ও জেলের বিধান না থাকায় দোষীরা বার বার পার পেয়ে যাচ্ছে। বিদ্যমান ২৭টি আইন একীভূত করে আইএলও'র অনুমোদন নেওয়া হচ্ছে এবং তা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান তিনি। নতুন আইনের কাজ হবে সকল দুর্বলতা অতিক্রম করে শাস্তির মাত্রা ও এনফোর্সমেন্ট প্রক্রিয়া চালু রাখা। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করার বিধান এতে রাখা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা থেকে আমরা কয়েক ধাপ এগিয়ে যাব। শুধু মজুরি বৃদ্ধি হলেই কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবেনা এই অভিমত রেখে তিনি শ্রমিক প্রতিনিধির তোলা প্রশ্নের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন প্রস্তাবিত আইনে দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে এই তথ্য পাওয়ার পরও যদি মালিক সেখানে কাজ চালিয়ে যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে এই আইন কার্যকর হবে। "প্রতিরোধ নিরাময়ের চেয়ে উত্তম"এমন মক্তব্য রেখে তিনি তার আলোচনার সমাপ্তি টানেন।

সিপিডি-র ট্রাস্টি এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের (বিইএফ) সাবেক সভাপতি *লায়লা রহমান কবির* বেশ

কিছু পরামর্শ তুলে ধরেন। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ এমপ্লয়েজ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাছে কারখানা আইনের সংস্কার নিয়ে একটি প্রস্তাব গিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। ১৯৭৯ সালের কারখানা আইনের প্রসঙ্গ এনে তিনি জানান, এ আইনের আওতায় বিভিন্ন বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আছে। এই আইনের একটি ধারায় বলা আছে, পরিদর্শক যদি আরো কিছু চায় তাহলে সেভাবেই একে এমেন্ডমেন্ট করা যায়। সেটির উপর বিইএফ'র তরফ থেকে সংশোধনি প্রস্তাব করা হয়েছিলো এবং সেটি ছিলো ধারা ক্লস সি অব রুল থ্রি অব দি ফ্যাক্টরি রুলস ১৯৭৯। তিনি বলেন, কোন কারখানা যদি পণ্য প্রক্রিয়াজাত করা শুরু করে এবং তার কর্মচারীর সংখ্যা যদি ৫০ জনের বেশি হয় তাহলে যৌথ পরিদর্শক দলের কাছ থেকে একটি সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে। এই পরিদর্শক দলে বাংলাদেশ এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি থাকবে। কারখানা পরিদর্শনের পর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সন্তুষ্ট হলেই কেবল ঐ কারখানাটি প্রত্যয়নপত্র পাবে বলে এর তিন বা চার নম্বর ধারায় উল্লেখ করা আছে বলে তিনি জানান। কারখানাগুলোতে কী হচ্ছে তা যাতে জানা যায় এজন্য বিইএফ থেকে জাতীয় পর্যায়ের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবে এমন সংগঠন চাওয়া হয়েছিলো। আজ পর্যন্ত সরকার এ ব্যাপারে কোনো রকমের পদক্ষেপ নেয়নি বলে তিনি অভিযোগ তোলেন।

কারখানা পরিদর্শন বিভাগগুলোর জনবলের দুর্বলতা বেসরকারি সংগঠন গুলোর সহায়তায় কাটিয়ে উঠা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। বেসরকারি সংগঠনগুলোকে ঠিক মতো তা করছে কিনা তা তদারকি করার দায়িত্ব সরকার নিতে পারে বলে মতামত দেন তিনি। কারখানা আইনের বাস্তবায়নে সুশীল সমাজকে যুক্ত করার পরামর্শ দেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক *নাসরিন খন্দকার* মনে করেন কারখানার পরিবেশ উন্নতি শুধু আইন মানার বিষয় নয়, এটি দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপার। শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে মন্তব্য করে উদাহরণ হিসেবে তিনি কারখানার মেইন গেট বন্ধ থাকার বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন কাজ করার সময় মেইন গেইট বন্ধ থাকবে এটা কোন শ্রমিক মানতে রাজি হবেনা। এই পরিস্থিতি শুধুমাত্র গার্মেন্ট শ্রমিক নয় গৃহ পরিচারিকাদেরকেও একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় বলে উল্লেখ করে গৃহস্বামী বাইরে যাওয়ার আগে বাড়ি তালাবন্ধ করে যায় বলে উদাহরন হিসেবে তুলে ধরেন। একই ধরনের নেতিবাচক মানসিকতার কারণে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠছে না। মনে করা হচ্ছে সব ট্রেড ইউনিয়নই দুর্নীতিগ্রস্ত। গার্মেন্ট শিল্পে কোন অঘটন ঘটলে তার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গুলোকে দায়ী করার মানসিকতা থেকে বের হয়ে তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন।

এ দেশের গার্মেন্টস শিল্পের বয়স ২৬ বছর হয়েছে এবং এটি একটি নবীন শিল্পের জন্য খুব একটা বড় সময় না মন্তব্য করে *অধ্যাপক নাসরিন খন্দকার* আরো বলেন, কারখানাগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে চালু করলে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে স্বীকৃতি দিলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করেন। ট্রেড ইউনিয়ন গুলোকে শক্তিশালী করতে তিনি মালিক পক্ষের সহযোগিতা চেয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানেন।

শ্রম অধিদপ্তরের উপ পরিচালক *এম এ খালেক* তার আলোচনার শুরুতে আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা শ্রম পরিদপ্তর অথবা কল কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করে শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ ১৯৯৯'র ২৪ এবং ২৫ ধারার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই আইনে পার্টিসিপেশন কমিটির কথা বলা হয়েছে। যে সমস্ত কারখানায় ৫০ জনের উপরে শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত আছেন সেখানে এই কমিটি থাকবে এবং সমান সংখ্যক ব্যবস্থাপনা ও ওয়ার্কার্স সদস্য নিয়ে তা তৈরি হবে। যে সমস্থ প্রতিষ্ঠানে সিবিএ বা শ্রমিক ইউনিয়ন আছে সেখানে তারা সাধারণত মালিকের সঙ্গে বেতন-ভাতা ইত্যাদি নিয়েই আলোচনা করে থাকেন বলে তিনি উল্লেখ করেন, একটি প্রতিষ্ঠান বা ফ্যাক্টরিতে আরও যে অনেক বিষয় আছে সে সমস্ত বিষয় কখনোই আলোচনায় প্রাধান্য পায় না। অথচ শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ২৪ ও ২৫ ধারায় যে পার্টিসিপেশন কমিটির কথা বলা আছে সেখানে সমস্ত বিষয় আলোচনা হতে পারে বলে *খালেক* তার প্রস্তাবনায় তুলে ধরেন। প্রত্যেকটি কারখানায় শ্রমিক কল্যাণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে আলাদা আলাদা কমিটি করা এবং তাদের দুইমাসে কমপক্ষে একটি বৈঠক বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাবনা দিয়ে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, শ্রম পরিদপ্তর থেকে কারখানাগুলোতে সমন্বয় কমিটি করার জন্য অনেক চিঠিপত্র লেখার পরও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। উল্টো বলা হয়েছে এগুলোর প্রয়োজন নেই। অথচ মালিক, শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থে স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শ্রমিক কল্যাণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিটিগুলো যদি কাজ করতো, প্রতিনিয়ত পরিস্থিতি তদারকি করতে পারতো তাহলে পরিস্থিতির এত দিনে অনেক উন্নতি হতো।

সাউথ এশিয়া এলায়েন্স ফর পোভার্টি ইরাডিকেশন-এর *সৈয়দা মুনিরা খাতুন* ইমারত নির্মাণ বিধিমালা এবং তার প্রয়োগ নিয়ে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইমারত নির্মাণের অনুমতি দেয়ার কর্তৃপক্ষ এবং ইমারত নির্মাণের আলাদা বিধি থাকার পরেও তা ঠিকমতো পালিত হচ্ছে না। দীর্ঘ মেয়াদে এই আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়ার উপর জোর দিয়ে ১৯৯৩ সালের বিধিমালা পাল্টে নতুন বিধিমালা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বিল্ডিং কন্সট্রাকশন এ্যাক্ট কার্যকর করার প্রস্তাব করেন তিনি।

সরকার গরীবের বন্ধু নয়

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি *আবুল হোসেন* এ ধরনের সংলাপ আয়োজন করা সিপিডি-র দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতার দিকটি তুলে ধরে তিনি বলেন, এ সংক্রান্ত আইন ও তার প্রয়োগের দায়িত্ব সরকারের ছিলো, আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার ৩৫ বছরেও আমাদের সরকারে যারা এসেছে তারা গরিবের বন্ধু হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে পারেনি। *আবুল হোসেন* দুঃখ করে বলেন, গত একমাসে প্রায় দুই শ' গার্মেন্ট শ্রমিক এর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র শোক প্রকাশ করেছেন। তার উল্টো চিত্র হিসেবে ক'দিন আগে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিদেশে শান্তিরক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দেয়াতে গোটা দেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো।

আবুল হোসেন আরো বলেন, গার্মেন্টস মালিকরা ব্যবসা করেন মুনাফার জন্য এটা মানতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই মুনাফা যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় সেরকম কিছু চিন্তা-ভাবনা মালিকদের করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে নিপীড়নমূলক শ্রমব্যবস্থা দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে শিল্প চালানো তথা

ব্যবসা করা সম্ভব নয়। তার মতে বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে গার্মেন্ট ব্যবসা দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে সরকারের দিক থেকে কতগুলো বিষয় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। কোন মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য গোটা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়া উচিত নয়। *আবুল হোসেন* আরো বলেন, গার্মেন্ট শ্রমিকরা এখন পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করেনি এবং গত দুই যুগে তাদের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেনি।

শ্রমিকদের মজুরির প্রসঙ্গে *আবুল হোসেন* বলেন, ১২ বছর আগে আমাদের শ্রমিকরা ৩০ ডলার করে বেতন পেতো। আমাদের মালিকরা ডলারে আয় করেন। এখন যদি শ্রমিকদের সেই আগের ৩০ ডলার হিসেবেও মজুরি দিতো তাহলে মজুরি বাড়তো কিন্তু সেটা না করে মজুরি দেওয়া হয় টাকার হিসেবে। তিনি উল্লেখ করেন যখন আনিসুল হক ক্ষমতায় ছিলেন তখন তার কাছে ন্যূনতম মজুরি ২ হাজার ৫শ' টাকা করার সুপারিশ দেয়া হয়েছিলো। মালিক পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো, এত বেশি মজুরি দিলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অথচ জাতীয় পে-কমিশন ২ হাজার ৪শ' টাকা ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করেছিলো। মালিক পক্ষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে দেশটার স্বার্থে, আপনাদের ব্যবসা, আমাদের শ্রমিকের নিরাপত্তা এইগুলো বিবেচনা করে আপনারা কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন। আমরা শ্রমিকরা আছি মালিকদের সাথে"।

গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক *রুহুল আমিন* কারখানা গুলোতে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে গার্মেন্ট মালিকদের দায়ী করেন। গার্মেন্ট মালিকরা যে অর্থ দিয়ে এই কারখানা করছেন সে অর্থের যোগান কীভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। মালিকরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যে কারখানা গড়ে তুলছে তা ফেরত দেয়া হয় কিনা সে প্রশ্ন তোলেন তিনি। নানা সময়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলো হত্যা কিনা সে সন্দেহের দিকে ইঙ্গিত করে *রুহুল আমিন* বলেন, এই ঘটনার পরে ঋণের টাকা ব্যাংকে পরিশোধ করা হচ্ছে কী না, নাকি ব্যাংকের টাকাকে নিজের টাকা বানানোর জন্যই এই ধরনের ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে সেটা তলিয়ে দেখা দরকার।

জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের আইন বিষয়ক সম্পাদক *আকসি চৌধুরী* দেশের বিদ্যমান শ্রম আইনগুলোকে বৃটিশ আইনের উত্তরাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, বৃটিশ শাসকরা যে আইনগুলো তৈরি করেছিলো এখন পর্যন্ত আমরা সেই আইনগুলোরই চর্চা করছি। বৃটিশরা এই আইনগুলো এদেশে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার কৌশল হিসেবেই প্রণয়ন করেছিলো। শ্রমিক এবং মালিকের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে না উঠার এটিও একটি বড় কারণ বলে তিনি মন্তব্য করেন। কমপেনসেশন এ্যাক্টের প্রসঙ্গ টেনে এনে *আকসি চৌধুরী* বলেন, একজন শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য মাত্র ১ লাখ টাকা, সমসাময়িক দুনিয়াতে এত কম ক্ষতিপূরণের বিধান আর কোথাও নেই। ভারতের মতো দেশের কমপেনসেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী এধরনের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ ৭ লাখ টাকা। শিল্প কলকারখানার মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, "এই রাষ্ট্রব্যবস্থা আপনাকে অবকাঠামো দিয়েছে, ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, আপনাদের ভিআইপি মর্যাদা দিয়েছে, আপনাকে বৈদেশিক লেনদেনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে"। এই সকল সুবিধার বিনিময়ে "আপনি শ্রমিকদের খাটিয়ে সঠিক বেতন-ভাতা দিবেন"। এজন্য মালিক এবং শ্রমিক কেউ কাউকে করুণার পাত্র হিসেবে দেখার কোন কারণ নেই। কিন্তু মালিকরা শ্রমিকদের প্রতি করুণা দেখাচ্ছে এমন আচরণ করে বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এটি মানবতার প্রতি দারিদ্রকে কটাক্ষ করার সামিল।

দেশের ৯০ ভাগ ইমারতের কোন বিল্ডিং কোড মানা হয়না বলে বিজেএমইএর পরিচালক *লুৎফর রহমান মতিন* যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তার জবাবে *আকসি চৌধুরী* বলেন, "একটি খারাপকে আরেকটি খারাপ দিয়ে প্রতিরোধ করা যায় না, ভালোকে ভালো দিয়ে মোকাবেলা করতে হয়"।

গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি *মোশরেফা মিশু* তার আলোচনায় কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা, মজুরি ও শ্রম আইন নিয়ে আলোচনা করেন। সংলাপের শুরুতে *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য* শিল্প শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশের নিরাপত্তা প্রশ্নে যে আলোচনা করেছেন তা গার্মেন্টস সেক্টরের সাথে যুক্ত একজনকে দিয়ে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করতে দেওয়া উচিত ছিলো বলে *মোশরেফা মিশু* মন্তব্য করেন। গার্মেন্ট কারখানায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজিএমইএ নেতারা অর্থাৎ মালিকপক্ষ সবসময় বলে তারা নিরপরাধ। কিন্তু গার্মেন্টস কারখানায় যে দুর্ঘটনা গুলো ঘটছে তা আইন, নৈতিকতা, গণতন্ত্র, মানবিকতা কোন দিক থেকেই এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই বলে মতামত দেন তিনি।

গার্মেন্টস শিল্পে মজুরি ও নারী শ্রমিকদের নানা শোষণের প্রক্রিয়া বিস্তারিত আলোচনা করেন *মোশরেফা মিশু*। তিনি বলেন "নারী শ্রমিকদের ১০০ ঘন্টা ওভার টাইমের ৬০ ঘন্টা কেটে নেওয়া হয়, ৫টার পরে ১১টা বা ১২টা পর্যন্ত একজন নারী শ্রমিক কাজ করার পর তার কার্ডে উপস্থিতি লিখা হয় ৫টা বা ৬টা। রাত বারোটার সময় সে যখন ঘরে ফিরে আসে তখন তার বাবা, তার স্বামী এতরাতে কোথায় ছিলে সে প্রশ্ন তুলে বলে *মিশু* উল্লেখ করেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত সেই শ্রমিক "কাজ করে ফিরেছি" জবাব দিলে তার স্বামী কার্ড চেক করে দেখতে পায় সেখানে ৫টা পর্যন্ত বা ৬টা পর্যন্ত উপস্থিতি দেওয়া আছে। এই বাকি ৪ ঘন্টার হিসেব নিয়ে অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, মা-মেয়ের মধ্যে, বাবা-মেয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেছে"। এই পরিস্থিতিগুলোকে সামগ্রিক কারখানার কর্মপরিবেশের অংশ হিসেবে মনে করেন তিনি। কারখানাগুলোতে নিরাপদ সুস্থ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে না পারলে এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করতে না পারলে এই শিল্পের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তার ব্যাপার আছে বলে তিনি মতামত দেন।

গার্মেন্টসগুলোতে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা প্রসঙ্গে *মোশরেফা মিশু* জানান, কোন কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ হলে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ডাকা হয়। যাওয়ার পর শ্রমিক নেতাদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের কুৎসা রটনা করে শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর জন্য আমাদের শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে কে রেজিস্টার্ড, কে রেজিস্টার্ড না ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলো থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মালিক, কারখানা পরিদর্শক ও সরকার যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে যথার্থ শ্রমিক প্রতিনিধিদের কী করবার থাকে সে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অ্যালায়েন্স ও নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের আহবায়ক *মাসুদা খাতুন শেফালি* বর্তমান পরিস্থিতিতে মালিকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় নেই মন্তব্য করে তার আলোচনা শুরু করেন। কারখানা গুলোতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলোকে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, এটি একটি জাতীয় দুর্যোগে পরিণত হয়েছে। সেখানে মালিক পক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাধানের পথ বের করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। সিপিডি-র আয়োজন করা সংলাপ নিয়মিত হওয়া উচিত মন্তব্য

করে তিনি গার্মেন্ট শিল্পের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ওয়াচ গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব দেন এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য তাদের সভা তিনমাস পর পর হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি *মামুনুর রশিদ চৌধুরী* বাংলাদেশের দুর্নীতিতে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে গার্মেন্ট শিল্পে দুর্ঘটনার ঘটনায় চ্যাম্পিয়ন যাতে না হতে হয় সে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। আন্তর্জাতিক বাজারে গার্মেন্ট শিল্প বেঁচে থাকুক এবং গড়ে উঠুক, শ্রমিকরা সুষ্ঠু ও নিরাপদভাবে যাতে কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়ে তিনি ড. ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেক ভালো সময়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সরকার যাতে একটা কিছু করতে পারে এজন্য বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে তুলে ধরতে হবে।

বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি *আব্দুল মুকিত খান* বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। গার্মেন্টস শিল্পকে দেশের জাতীয় পুঁজি গড়ে উঠার সাথে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের দেশে এখনো জাতীয় পুঁজি গঠিত হয়নি। জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য, জাতীয় পুঁজি গঠনের দরকার। জাতীয় পুঁজি গঠনের জন্য শিল্পবান্ধব শিল্পনীতি, শ্রমিকবান্ধব শ্রমনীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে দেশের প্রধান শিল্প হিসেবে গার্মেন্টসকে চিহ্নিত করে বলেন, এখন গার্মেন্টসকেই আমাদের শিল্পায়নের একটি ভিত্তি বলে ধরে নিতে হবে। পাটশিল্প বা অন্যান্য শিল্পের জন্য যেরকম শিল্প নগরী গড়ে তোলা হয়েছিলো একই রকম ভাবে গার্মেন্টস পল্লী বা গার্মেন্ট নগরী গড়ে তোলা যায় কী-না তা খতিয়ে দেখতে সরকারের প্রতি আহবান জানান তিনি। এজন্য ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় শহরের নাম প্রস্তাব করে তা মনিটরিং করার লক্ষ্যে মালিক, শ্রমিক, সরকার ও সিভিল সোসাইটিকে নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। একে-অপরের বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষ না হয়ে সপক্ষ হয়ে কাজ করে জাতীয়ভাবে উৎপাদনের, সৃজনের, উন্নয়নের একটি জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক *ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান* বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় তৈরি হওয়া কমপ্লায়েন্স কমিটি শ্রমিকদের চোখে ধুলা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গার্মেন্টস শিল্পের সমস্যা সমাধানে কিছু করতে পারবে না। এই কমিটি শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতায় হওয়া উচিত এই প্রস্তাব করে এতে স্বরাষ্ট্র, বাণিজ্য সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় এর সাথে যুক্ত হতে পারে বলে মতামত দেন। শ্রম আইনের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টি শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতায় বলে তিনি আরো যোগ করেন। প্রথমত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, কে কোন কারখানার শ্রমিক এটার কোনো স্বীকৃতি নেই। শ্রমনীতি ও আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান করার পাশাপাশি দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান হিসেবে বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যায্য মজুরি দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। এই মজুরি দেওয়া না হলে তার প্রভাব পরিবেশের উপরও পড়বে বলে তিনি আশংকা করেন। তৃতীয়ত পার্টিসিপেশন কমিটির ২৪ এবং ২৫ ধারা অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিয়ে একে সক্রিয় করার প্রস্তাব করেন তিনি।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা *সহিদুল্লাহ চৌধুরী* বলেন, গার্মেন্ট শিল্প সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত, এই তথ্য বিভ্রান্তিকর ও অর্ধসত্য। সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি একে সর্বোচ্চ ব্যয়কারী সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত

করেন তিনি। আয়-ব্যয়ের পর নীট কী থাকে এটা জানানোর আহবান জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং বিলস্ এর সম্পাদক *কবির হোসেন* সিপিডিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আইন সংস্কার করতে হবে, হালনাগাদ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই আবাসিক ভবনে কারখানা বসানো যাবে না। এটি সরকারের দেখার দায়িত্ব। *কবির হোসেন* কারখানাগুলোর সিঁড়ি প্রসঙ্গে বলেন, আইনে দু'টো সিঁড়ির কথা বলা হয়েছে। আইন মানার জন্য এমওইউ হয়েছে আইএলও'র সঙ্গে। সেই কারণে এমন একটি বিকল্প সিঁড়ি দিচ্ছে যে ঐ সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলেই মানুষ মারা পড়বে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সুতরাং ওই সিঁড়ি হলো একটি বাতুলতা মাত্র। এটি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া বিল্ডিং কোড আপডেট করে তা মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি মত দেন। তিনি বাড়িওয়ালাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এটি সকলের নাগরিক কর্তব্য। বাড়িওয়ালা যাকে ভাড়া দিবেন তিনি যেন ফ্যাক্টরি না তৈরি করেন। তিনি প্রস্তাব করেন এরপরও যদি কোন বাড়িওয়ালা গার্মেন্টের জন্য বাড়ি ভাড়া দেয় তাহলে বাড়িওয়ালাকেও শাস্তি দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইন থাকা প্রয়োজন বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

বস্ত্র ও পোশাক শিল্প শ্রমিক লীগ সভাপতি *জেড এম কামরান* মৃত্যুর হার নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে কারণ সঠিক সংখ্যা কেউ দিচ্ছে না। সরকারও দিচ্ছে না, বিজিএমইএও দিচ্ছে না। পারলে কিছু লুকানো হয়। এরপর তিনি গার্মেন্টস দুর্ঘটনার বিষয়ে বলেন, সবচেয়ে বেশি ব্যর্থতা হলো বাংলাদেশ সরকারের। দেশে যে আইন আছে তা যুগোপযোগী না ঠিক আছে সে প্রশ্ন না তুলে যেটুকু আইন আছে তার বাস্তবায়ন দরকার।

গার্মেন্টস শ্রমিক *নাজমা আক্তার* ২০০৫ সালের আশংকার কথা বলতে গিয়ে বলেন, এ দেশ থেকে ফ্যাক্টরি চলে যেতে পারে এই আতঙ্কে শ্রমিকরা অনেক চেষ্টা করেছে এই শিল্পটাকে টিকিয়ে রাখতে। সবাইকে শ্রমিকরা বলেছে বাংলাদেশে এই একটাই খাত যেখানে মহিলারা কাজ করছে। বিকল্প কোনো কাজের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু নারীদেরকে সস্তা শ্রম দিয়ে দুর্বল করে রাখা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ তুলে বলেন, এটি বন্ধ করা গেলে এই সেক্টরে বোধহয় এই ঘটনাগুলো ঘটতো না। *নাজমা আক্তার* গার্মেন্ট মালিকদের দায়ি না করে বলেন, "সারা বিশ্বের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও আমাদের দেশ থেইকা অল্প দামে শ্রম নিয়া মুনাফা অর্জন করতাছে। আমাদের গার্মেন্টস মালিকের পদ্ধতিটাও এক"। তিনি বলেন, "বার বছর ধইরা লেবার ল রিভিউ ফোরাম হইছে, সংশোধন হচ্ছে কিন্তু শ্রমিকদের কিছুই হচ্ছে না। ৮৩ বছর আগের ক্ষতিপূরণ আইনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এ দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসতেছে এই শিল্প থেকে, শ্রমিকরা গোল্ডেন গার্ল কিন্তু তারা মরে যাচ্ছে সবচাইতে বেশি"।

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তিনি আরো বলেন, "শ্রমিকদের সস্তা শ্রম বলবেন না। গার্মেন্ট সেক্টরটা টিকে থাক এইটা শ্রমিকরা চাই। কারণ আমি এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করে আজকে এই টেবিলে বসার মতো যোগ্যতাটা পাইছি, শিল্পই এটা কইরা দিছে। অতএব শিল্পটা যেন ধ্বংস হয়ে না যায় সবাইকে মিলে এগিয়ে এসে এই কাজটা করতে হবে।" বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, "ওইগুলা হইলো বড় শয়তান। জেগে থেইকা ঘুমানোর ভাব ধরে থাকে। যে রকম মুনাফা নিচ্ছে দেশীয় মালিকরা, তেমন মুনাফা নিচ্ছে তারা। "

জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক শিল্প ফেডারেশন ও সমন্বয়কারী গার্মেন্ট শ্রমিক ও শিল্প রক্ষা জাতীয় মঞ্চ এর সভাপতি *মো: বাহরাইনে সুলতান বাহার* তার আলোচনার শুরুতেই বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের কোনো পরিচয় নাই। গার্মেন্টস শ্রমিকরা সকাল ৬টা থেকে শুরু করে রাত ১২টা, একটা, হরতাল, ধর্মঘট না মেনে ঝড়, বৃষ্টি, বাদল সবকিছুকে উপেক্ষা করে তারা কাজে চলে আসে। কিন্তু তাদের কোনো পরিচয়পত্র নাই। কেটিএস গার্মেন্টসের দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "দুর্ঘটনার পর বিজেএমইএ নেতৃবৃন্দ ভেতরে না ঢুকে সিঁড়ি থেইকা চইলা আসছে। পরে উনারা মেডিকেল গেছেন। শ্রমিকদের দয়া করে পরিচপত্রটা দেন।"

বাহার আরো সুপারিশ করেন, গার্মেন্টেসের প্রত্যেকটি বোর্ডের মধ্যে লেখা থাকতে হবে কতজন শ্রমিক প্রবেশ করেছে, কতজন বাইরে আছে, কতজন ছুটিতে আছে। তাহলে গার্মেন্ট শ্রমিকদের একটি তালিকা থাকবে। তাহলে ওই তালিকা দেখলে অন্তত শ্রমিকরা বলতে পারবে এখানে এতজন শ্রমিক আছে। এছাড়া কারখানায় কোনো অবস্থাতে তালা থাকতে পারবে না এবং সিঁড়িতে কোনো রকম বাধাগ্রস্ত অবস্থান থাকতে পারবে না। এবং প্রতিটি কারখানায় কারেন্টের শর্ট সার্কিট এর জন্য বিদ্যুৎ ব্রেকার থাকতে হবে। যেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে।

কর্মজীবী নারীর সভাপতি *শিরিন আক্তার* ১৯৯০ সালের আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, তিনটি রাজনৈতিক জোট ঐক্যবদ্ধভাবে বিশাল একটি সংগ্রাম করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং তারপরে প্রফেসর রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স হয়েছিল। তখন অনেকগুলো বই তৈরি করা হয়েছিলো এবং সকলের করণীয় সম্পর্কে সেখানে লেখাও ছিলো। সম্ভবত সে বইগুলো এখন পোকায় কাটছে।

শিরিন আক্তার বলেন, দেশে শ্রম আইন আছে। সেটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং এর জন্য কী করা দরকার সেটা আজকে সব চাইতে বড় প্রয়োজন। আমাদের দেশে অনেক আইন আছে, এতো আইনের প্রয়োজন নেই। যে আইন আছে তা বাস্তবায়ন করাই বড় ব্যাপার।

সব শেষে তিনি মালিকদের উদ্দেশ্য করে বিনয়ের সাথে বলেন, শীতের দিনে রাতের বেলা একটা সোয়েটার গায় দেয়ার জন্য একটা শ্রমিককে যদি পিটিয়ে হত্যা করা হয় আর কেউ যদি বলেন এটা হতেই পারে, এই কথা মেনে নেয়া যায় না। তিনি আরো বলেন, শ্রমিককে এতো সস্তা মনে করার কোনো কারণ নেই। শ্রম কখনো সস্তা নয়, শ্রমিক দয়ার পাত্র নয়। সুতরাং মনে করতে হবে মালিক-শ্রমিক আমরা একটি চুক্তি সই করেছি এবং আমাদের মানবাধিকার আছে। এই রাষ্ট্র এই পৃথিবী আমাদেরকে কতগুলো মৌলিক অধিকার দিয়েছে। সেখানে মালিক এবং শ্রমিক আমরা দু'জনে চুক্তিবদ্ধ। সেই চুক্তিকে সম্মান দেখিয়ে আমরা যাতে কাজ করতে পারি সেই চেষ্টা করতে হবে।

শিল্পটা বন্ধ হোক কেউই তা চায় না

গার্মেন্টসে দুর্ঘটনা বিষয়ে মালিকরা দায়ী এই অভিযোগ মানতে নারাজ গার্মেন্ট মালিকরা। নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজিএমইএ পরিচালক *লুৎফর রহমান মতিন* বলেন, আমরা কেউই চাই না এ শিল্পটা দ্রুত বন্ধ হয়ে যাক। দুর্ঘটনার পুরোপুরি দায়দায়িত্ব মালিক পক্ষের নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে ঢাকার ৯০

শতাংশ এলাকা এবং ৬০ শতাংশ বিল্ডিং বসবাসের উপযোগী নয়। সম্প্রতি ধ্বংস হওয়া ফিনিক্স ভবনের দায়দায়িত্ব শুধুমাত্র গার্মেন্টস মালিকদের নয়। দীর্ঘ দিনের অব্যবস্থাপনার কারণে শহরের ভবনগুলোর বেশির ভাগই অপরিকল্পিত ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। গার্মেন্ট মালিকরা তাতে কারখানা স্থাপন করার পর তা যদি ধ্বসে পড়ে তাহলে সেই দায় শুধু মালিকদের উপর কেনো বর্তাবে সে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এক্ষেত্রে সরকারেরও করণীয় সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে *লুৎফর রহমান* বলেন, আজ থেকে ৫০ বছর আগে থেকেই বা ৩০ বছর আগে থেকেই বিল্ডিং কোডসহ সমস্ত শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা সরকারের উচিত ছিল। এই অবস্থায় নিজেদেরকে নিরপরাধ হিসেবে দাবি করার প্রেক্ষিত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ফ্যাক্টরি করার সময় আমরা ট্রেড লাইসেন্স, কারখানায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার অনুমোদন নিয়েছি এবং তার প্রেক্ষিতে ওয়ারিং করা হয়েছে। প্রধান কারখানা পরিদর্শক ফ্যাক্টরি ডিজাইন, ফ্যাক্টরি স্ট্রাকচার ডিজাইন সব দেখেই শিল্প গড়ার অনুমতি দিয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

বিজিএমইএ পরিচালক আরো বলেন, হঠাৎ করে ইচ্ছে করলেই চার হাজার বিল্ডিং ঢাকা থেকে সরিয়ে নেয়া যাবেনা। হঠাৎ করে নব্বই ভাগ বিল্ডিং ঢাকা থেকে ভেঙ্গে ফেলা যাবেনা। সকলে মিলে একটা ধ্বসে পড়া বিল্ডিং সরাতে পাঁচদিন সময় লেগেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এভাবে নব্বই ভাগ বিল্ডিং সরানো সম্ভব নয়। একে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। গার্মেন্ট মালিকদের পক্ষে তিনি সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ চান।

টেরি টাওয়েল এক্সপোর্ট এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি *আনিসুর রহমান* সংলাপে বিভিন্ন পক্ষ থেকে উঠা অভিযোগের মধ্যে কারখানাগুলোর দরজা বন্ধ থাকে, গেইটে তালা থাকে, বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়ে প্রভৃতি ঘটনা গুলোকে সাম্প্রতিক অতীতের বিষয় হিসেবে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমি বাইশ বছর শ্রমিকদের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে তিনি ৪টি ফ্যাক্টরি চালাচ্ছেন জানিয়ে বলেন, মূল সমস্যা মানসিকতার বা মাইন্ডসেটআপের। উপস্থিত অন্যান্য মালিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শ্রমিকদের ভালবাসতে হবে। তাদের সাথে কথা বলতে হবে। তাদের সাথে মিশতে হবে। তারা জানবে যে, "উনি আমার মালিক না, উনি আমার বন্ধু"। কর্ম পরিবেশ বলতে শুধু ফ্যাক্টরি তালাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়, এর বাইরেও কারখানা কিভাবে চালানো হবে, শ্রমিকরা তার কর্মপরিবেশে মানসিক স্বস্তি পাচ্ছে কিনা, কর্মক্ষেত্রে সে সহজ ও খুশি কিনা এবং তাকে কি কি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে সেগুলোও যুক্ত করার জন্য তিনি বলেন।

শ্রমিকরা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় কিনা সে ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার আহবান জানিয়ে মালিকদের উদ্দেশ্যে *আনিসুর রহমান* বলেন, মালিকরা কোন সময় শ্রমিকের গায়ে হাত তোলা বা গালিগালাজ করেনা। এক্ষেত্রে কারখানাগুলোর মধ্যস্তরের কর্মকর্তাদের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'বাবু যত বলে পরিষদ কহে তার ততগুন'। এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমি আমার বিগত ২৬ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি আমার ফ্যাক্টরিতে একদিনও ধর্মঘট হয়নি, শ্রমিকের সাথে কোন গোলমাল হয়নি। তাদের সাথে আমার কোন তর্কাতর্কি হয়নি। বরং আমার বিপদের সময় শ্রমিকরা দৌড়ে এসে আমাকে উদ্ধার করেছে। মহিলা শ্রমিকদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়ে মালিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, মহিলাদের

ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যদের ক্ষেত্রে অসুখ বিসুখে স্ববেতনে ছুটি যাতে শ্রমিকরা পায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে মালিকদের প্রতি আহবান জানান।

বিজিএমইএ সভাপতি *এস এম ফজলুল হক* শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে আত্বপক্ষ সমর্থন হিসেবে কেটিএস গার্মেন্টে দুর্ঘটনার সময়ে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "কেটিএস গার্মেন্টে যখন আগুন লেগেছে শুনলাম, আমাকে ফোন করা হলো। আমি তখন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছেছি মাত্র। আমি কারখানায় যাওয়ার পথে আমাকে ১০টি ফোন করা হয়েছে না যাওয়ার জন্য। বলা হয়েছে হাজার-হাজার মানুষ সেখানে এবং সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে, আপনি যাবেন না। তাদের কথা উপেক্ষা করে কারখানায় গিয়ে আমি দেখলাম জ্বলন্ত অবস্থায় সেখান থেকে মানুষ বেরুচ্ছে। কারো শরীরে অনেক পুড়ে গেছে, কেউ সামান্য পুড়েছে। প্রথমত সেখানে র‍্যাব ও পুলিশ ছিলো না, পরে পুলিশ, র‍্যাব, ফায়ার ব্রিগেডের কর্মকর্তারা এসে জায়গাটাকে কর্ডন করে রাখে চতুর্দিকে। সেখানে লোকজনকে হাসপাতালে নেওয়ার কোন বাহন ছিলনা বিধায় আমি চট্টগ্রাম ফেরত গিয়ে শহর থেকে বিশটি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছি। সবাইকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসার পর যার যতটুকু সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রাত ৩টা পর্যন্ত মালিকরা কালুরঘাট আসা-যাওয়া করেছে। আমিও তাদের সাথে ছিলাম।" কতজন সেখানে মারা গেছেন সেই পরিসংখ্যান না টেনে তিনি বলেন, আমি শুধু এটুকু বলতে চাই তাদেরকে দাফন করার সময় আমরা মালিকরা সবাই ছিলাম।

কারখানাগুলোতে নির্গমন সিঁড়ি না থাকা নিয়ে সংলাপে যে অভিযোগ উঠে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্গমন সিঁড়ি থাকার ব্যাপারে আইন আছে। সেখানে বলা হয়েছে, সিঁড়ির সামনে যে কলাপসিবল গেইট আছে সেটি খোলা থাকবে। কেউ যদি বন্ধ রাখেন তিনি আইন অমান্য করেছেন। আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে। এ নিয়ে বিজেএমইএর কোন দ্বিমত নেই।

ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলো সরিয়ে ফেলা প্রসঙ্গে *ফজলুল হক* জানান, বিজিএমইএ এজন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে এবং তা না করলে কী করা হবে সেটিও তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ নিট পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি *ফজলুল হক* বলেন, চিটাগাং-এর দুর্ঘটনার পরে পত্রিকায় বা টেলিভিশনে যে দৃশ্য উঠে এসেছে এর কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর নেই। তবে গার্মেন্টস দুর্ঘটনাকে হত্যাকান্ড বলার সাথে দ্বিমত পোষণ করে বিকেএমইএ'র সভাপতি বলেন, স্পেকট্রামের কথা ধরে একটু পুরনো দিকে গেলে, মালিক দুর্ঘটনার শিকার। কারণ উনার জানা ছিল না ওইদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পুরো ভবনটি আকস্মিকভাবে ধ্বসে পড়বে। হতে পারে যতোটুকু যত্ন নিয়ে কারখানাটি তৈরি করা উচিত ছিল তিনি ততোটুকু যত্ন নেননি। কিন্তু আগে থেকে প্ল্যান করে কাউকে মারলেই তাকে হত্যা বলা যায়। স্পেকট্রামের ক্ষেত্রে বলা যায়, যদি ঐদিন ওইখানে মালিক থাকতেন ওই ভবন কিন্তু মালিক হিসেবে উনাকে মাফ করতো না। এমনকি মিরপুরে এক মালিকও মারা গিয়েছিলেন যিনি সারাকা গার্মেন্টের এমডি ছিলেন। কেটিএস-এ যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেখানে যদি মালিক থাকতো তার পরিণতিও একই হতো। তাছাড়া মালিকরা এখন বেশির ভাগ সময় কারখানাতেই অবস্থান করেন কারণ ব্যবসাটি জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে যাওয়ায় এখন সার্বক্ষণিক ফ্যাক্টরিতে না থেকে টিকে থাকার উপায় নাই।

দুর্ঘটনায় শ্রমিকরা বেশি মারা যায় মালিকরা মারা যায় না এ ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে বিকেএমইএ সভাপতি বলেন, দেশে শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ২০ লাখ, মালিকের সংখ্যা আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার। একটি দুর্ঘটনা যখন ঘটবে থিউরি অব প্রবাবিলিটি অনুযায়ী শ্রমিকের মারা যাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি থাকবে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি বলেন, মালিকরা কেউ ইচ্ছে করে দুর্ঘটনা ঘটুক তা চাই না। তর্কের খাতিরে শ্রমিকের জীবনের কোনো মূল্য নেই এটা ধরে নিলেও টাকার প্রতি তো আমার মায়া আছে, ব্যবসার প্রতি আমার মায়া আছে। সুতরাং আর যাই হোক মালিক তার ব্যবসাটা রক্ষা করতে চায়, সে চায় না তার টাকা নষ্ট হোক। এটি আসলে একটা দুর্ঘটনা বলেই তিনি মন্তব্য করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের শিল্প কমিশন গঠনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মালিকরাও এটি করা প্রয়োজন বলে মনে করে। বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য যারা আছেন তাদের নেয়া উদ্যোগগুলো আরো কার্যকরী করার কথা ভাবতে হবে। কারখানার তালা বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে মালিকদের কোনো নির্দেশ নাই। তর্কের খাতিরে ঘটনাটি এমন হতে পারে। গার্ড তার এবং তার দায়িত্ব নিরাপদ করার জন্য তালা দিয়ে রাখে। বিকেএমইএ'র সভাপতি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার নির্দেশ আছে তালা খোলা রাখার। কিন্তু একদিন আমি আমার ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখি তালা বন্ধ। আমি জিজ্ঞাস করলাম। গার্ড আমাকে বললো, "স্যার এখানে আজে-বাজে ছেলেরা যাতায়াত করছিল আমি তালাটা বন্ধ রাখছি।" গার্ড কিন্তু এখানে নিজের নিরাপত্তার জন্য এটি করেছে কারণ তালাটি খোলা থাকলে তাকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়। তার দায়দায়িত্ব অনেকটা বেড়ে যায়। সুতরাং মালিকের নির্দেশের বাইরে অনেক সময় গার্ড তার নিজ স্বার্থে তালা বন্ধ রাখে।

বিজিএমইএ'র কমপ্লায়েন্স কনসালটেন্স *ব্যারিস্টার জেনিফা কে জব্বার* বলেন, বিজিএমইএ কিন্তু বসে নেই তারা ১৯৯০ সাল থেকে এ ব্যাপারে কথা বলে আসছে। ২০০১ সালে চৌধুরী নিটওয়ারে শ্রমিক মারা যাওয়ার পর বিজিএমই একটা ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নেয়। বিজিএমইএ একটি টিম গঠন করে ৪০ জনকে নিয়োগ দিয়ে সব ফ্যাক্টরিতে কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত বিষয়ে মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করেছে।

দুর্ঘটনা বৃদ্ধির কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, নতুন গার্মেন্ট হচ্ছে, নিট সেক্টরে বৃদ্ধি হচ্ছে। নতুন নতুন গার্মেন্টস হওয়াতে অসচেতনতা আছে। কারখানা পরিদর্শককে খুব দুর্বল বলা হচ্ছে যেটা সত্য। কারণ ৬৬জন কারখানা পরিদর্শকের পক্ষে বাংলাদেশের সবগুলো ফ্যাক্টরিকে সঠিকভাবে মনিটরিং করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রাইভেটাইজেশান এর সুপারিশ এসেছে কিন্তু জোর করে আইন করে এটা করলে সফল হবে কি না এটাও ভাবতে হবে।

বিজিএমইএ-র সাবেক সভাপতি *আনিসুল হক* শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় বলেন আমি এখন ফাঁসির কাঠগড়ায়। তবে অভিযোগগুলোর সাথে একমত পোষণ করি না। তবে, অনেক কারখানাতে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নেই শ্রমিক নেতৃবৃন্দের এমন অভিযোগের সাথে কিছুটা একমত পোষণ করে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, ৫৩ টি কারখানা আমি নিজে পরিদর্শন করেছি যার বেশির ভাগের অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। বিজিএমইএ থেকে

তাদেরকে ৪৫ দিনের নোটিশ দিয়ে বলা হয়েছে ব্যবস্থা না নিলে আমরা কারখানা বন্ধ করে দেব। কিন্তু এর ফলাফল হিসেবে ১৬ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী আপাতত চাকরি হারাবেন। বিল্ডিং কোড না মানার ব্যাপারে আসা অভিযোগের সাথে একশ ভাগ একমত পোষণ করে বলেন, আমি একটি কারখানা করেছি রূপগঞ্জে সেখানে এ বিষয়ে কোন অথরিটি নেই। এ পরিস্থিতিতে কারখানা স্থানান্তর করতে হলে একবছর সময় লাগতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কারখানার তালা বন্ধ থাকাকে নিজে সমর্থন করেননা জানিয়ে *আনিসুল হক* বলেন, এটি মালিকের দোষ হলেও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট। *শিরিন আক্তার, ড. হামিদা হোসেন* এবং মিডিয়াকে কারখানাগুলো পরিদর্শনের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, সবাই মিলে ১০/১৫ দিন পরিদর্শন করলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে। মুল ফটক বন্ধ থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাস্তানের ভয়ে নিরাপত্তা কর্মীরা তালা লাগিয়ে ঘুমায় বলে মন্তব্য তিনি করেন। শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক লক্ষ টাকার দেয়া নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ২১ হাজার টাকা দেয় সরকার আর বাকি ৭৯ হাজার টাকা মালিককে ব্যক্তিগত ভাবে দিতে হয়।

গার্মেন্টসগুলোতে শ্রমিকদেরকে ঠিকমতো বেতন দেয়া হয়না এমন অভিযোগও পুরোপুরি অস্বীকার না করে তিনি বলেন, এ ধরনের অভিযোগ বিজিএমইএ'তে আসার পর ১০০ টাকার মধ্যে হয়তো ৮০ টাকা পেয়েছে। বিজিএমইএ'তে আসার পরও টাকা পায়নি এমন নিদর্শন পাওয়া যাবেনা বলে তিনি মন্তব্য করে জানান, আর্বিট্রেশন কমিটিতে এ সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায়। এসময় তিনি শ্রমিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে এধরনের কোন অভিযোগ থাকলে তা জানাতে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে যে কোন অভিযোগ শুনতে ও জবাব দিতে বিজিএমইএ প্রস্তুত। শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে জোর বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা না করে সম্মিলিতভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায় বলে অভিমত রাখেন।

ট্রেড ইউনিয়ন এবং ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিয়ে আরো চিন্তার অবকাশ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, ইপিজেডে মজুরি নিয়মিত এবং ভাল বেতন। বাইরে ৩০০ ডলার দেওয়া হলে এখানে ৬০০ ডলার দেয়া হয়। সেই ইপিজিডে ওয়ার্কার ওয়েলফেয়ার কমিটি করার পর থেকে শান্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এক পর্যায়ে সিপিডি-র চেয়ারম্যান *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* বলেন, আসলে সিপিডি-র এই সংলাপ কোন বির্তক সভা নয়। এখানে সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যেখান থেকে অনেক পরামর্শ বের হয়ে আসবে বলে আমরা আশা করছি। কিভাবে সবাই মিলে এগুলো বাস্তবায়ন করা যায় ও সকলকে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানো যায় পরবর্তীতে সেই আলোচনা করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

দুটো পক্ষের অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে

বাংলাদেশ ওমেন্স চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর ভাইস চেয়ারপার্সন *সেলিমা আহমেদ* বলেন, এই সংলাপে মালিক ও শ্রমিকের দু'টি আলাদা পক্ষ হিসেবে অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে মালিকরা তাদের মতো যুক্তি দিচ্ছে, শ্রমিকরা নিজেদের মতো যুক্তি দিচ্ছে। তিনি বলেন, এভাবে চললে সমাধান হবেনা কারণ একটি

কারখানা যখন পরিচালিত হবে দু'জনেরই লাভের জন্য। এটি শ্রমিকের লাভ, তার আর্থিক উপার্জন হচ্ছে এবং মালিকেরও আর্থিক লাভ হচ্ছে। মালিকরা শ্রমিক বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ তুললে তা কোনভাবেই সহ্য করা যায়না। শ্রমিক কাজ কম করছে কি বেশি করছে সেটা মালিকরা দেখবে। কিন্তু যদি চুরি করে, সাথে সাথে শ্রমিক বরখাস্ত হয়ে যাবে। কারণ এখানে নৈতিকতার একটি ব্যাপার আছে। একই ভাবে গার্মেন্টেসে পুড়ে মারা যাওয়া, বিল্ডিং ধ্বসে মারা যাওয়া, তালা বন্ধ অবস্থায় মারা যাওয়ার প্রশ্নে মালিকদের কোন ছাড় না দিতে শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানান তিনি।

ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রেসিডেন্ট *জনাব এম এ মমিন* সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, চেম্বার এর সদস্য ৪ হাজারের উপরে। বেশির ভাগই ক্ষুদ্র এবং মাঝারি। একদিকে ডলারের সংকটময় অবস্থা, অন্যদিকে বিদ্যুৎ নেই। শিল্প স্থাপন করতে হলে দীর্ঘমেয়াদে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করে বলেন, এটি এককালীন হয় না। মালিক যে বিনিয়োগ করবে, যে বিল্ডিং বা কারখানা তৈরি করবে–এটি যেন পরের প্রজন্ম এসে দেখতে পারে। তাহলেই একটি অর্থনীতির বুনিয়াদ শক্ত হয়। তিনি নিরাপত্তা বিষয়ে বলেন, নিরাপত্তা সবাই চায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কয়েকটি পরপর ঘটনা ঘটে গেছে। একটা সময় ছিল যখন দুর্ঘটনাকে একদিক থেকে দেখতাম। বাবার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আমি দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্যবসায়ী। আমার বাবাদের সময় বেশির ভাগই গার্মেন্টেসের যন্ত্র কেনার সময় নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা হতো যাতে মানুষ তা চালানোর সময় হাত না চলে যায়, যেনো পা-ও না কাটে। আজকাল কম্পিউটারের যুগে বোতাম টিপলেই সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। টেকনোলজিতে যে রূপান্তর হয়েছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর ফলে নিরাপত্তার বিষয়টি দুরে সরে গেছে। কিন্তু হঠাৎ করে বিল্ডিং ধ্বসার বিষয়টি আলোচনার বিষয় হয়ে গেছে। একটা সময় এলোপাথাড়ি গার্মেন্টস কারখানা হয়েছে। আজকে গর্ব করার মতো একটা জায়গায় গার্মেন্টস শিল্প এসেছে। যে ৬ শতাংশের বেশি জিডিপি গ্রোথ হচ্ছে এটার পিছনে মালিক শ্রমিক সবার একটা অক্লান্ত পরিশ্রম আছে। অবশ্যই মালিক শুধু নয়, যারা শ্রমিক–এটার পেছনে শ্রম দিয়েছে, তাদেরও অবদান আছে।

নটরডেম কলেজের শিক্ষক *অধ্যাপক এ এন রাশেদা* একটি মেয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, দশ বছর আগে একটি মেয়ে তার বাসায় বেড়াতে এসে বলেছিল, "খালাম্মা, আমরা বেশিদিন টিকতে পারবো না ওখানে। আমাদেরকে এতো বেশি পরিশ্রম করায় যে আমাদের শরীর ভেঙ্গে যায়"। তিনি অভিযোগ করে বলেন, গার্মেন্টস কারখানায় বেতন কম, ওভার টাইম করিয়ে শ্রমিকদের নিস্পেষিত করা হচ্ছে। ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে সরকার ভুমিকা রাখতে পারছে না বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, এ অবস্থা শুধু গার্মেন্ট শিল্পে নয় সারা দেশে। উদাহরন হিসেবে শিক্ষকদের মাসে মাত্র ৫০০ টাকা বেতনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

সাবেক সংসদ সদস্য *মো: দেলোয়ার হোসেন খান* গার্মেন্টসে সংশ্লিষ্টদের করণীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করে বলেন, বিল্ডিং কোড সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গার্মেন্ট শিল্পগুলো তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের কারখানা পরিদর্শক অফিসের কাঠামো পাকিস্তান আমলের, যখন বাংলাদেশে মাত্র কয়েক হাজার কারখানা বা দোকানপাট ছিল। কিন্তু বর্তমানে কয়েক লক্ষ কারখানা এবং কয়েক লক্ষ দোকানপাট হয়েছে। ফলে সংস্থাটি অনেকটাই নিস্ক্রিয়।

সরকারি কাজের প্রচার নেই

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব *গোলাম হোসেন* সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে গার্মেন্টস শিল্পের দুর্ঘটনা সহ নানা সমস্যা এবং সরকারি পর্যায়ে এই বিষয়গুলো তত্ত্বাবধানের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই শিল্প গড়ে উঠার প্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, গার্মেন্ট শিল্পের বয়স প্রায় ২৫ বছর। সমস্যা শুরু থেকেই আছে, ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে। কারণ হিসেবে তিনি শিল্প কারখানা এবং সমস্যা এদু'টির নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করা কালে উদাহরণ হিসেবে বলেন, কারখানা থাকলে এবং ইলেকট্রিসিটি থাকলে কোন না কোন ভাবে শর্ট সার্কিট করে। স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সহ অন্যান্য বিষয়ে সমস্যা শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের বহু দেশের শিল্প কারখানায় রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি নিজের পাঁচ বছর বিদেশে চাকরির অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমেরিকার মতো দেশেও বাংলাদেশের চেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটে। এই শিল্পের সাথে বাণিজ্যের সম্পর্ক থাকায় সরকারের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই শিল্পে রপ্তানি আয় সম্পর্কিত বিষয়গুলো দেখাশোনা করে বলে তিনি জানান। এই শিল্পের কমপ্লায়েন্স ও কারখানার মান দেখার জন্য সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি ফোরাম রয়েছে, এর বাইরেও শ্রম ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজেদের মতো করে এ বিষয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে। ২০০৪ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখ থেকে এ ব্যাপারে কাজ করার জন্য ন্যাশনাল সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম গঠিত হয়েছে বলে তিনি জানান। সরকারের এই ফোরামে মালিক, শ্রমিক, ক্রেতাসহ এই শিল্পের সাথে যুক্ত সকল পক্ষকে যুক্ত করা হয়েছে। এই ফোরাম এখনো চুড়ান্ত হয়নি এবং এতে আরো অনেকের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। শ্রমিক প্রতিনিধিরা কিভাবে এতে যুক্ত হবে সে প্রসঙ্গ তুলে ধরে বেশ কিছু সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানান গার্মেন্ট শিল্পে ৩০টির মতো ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করছে এবং এদের মধ্যে যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এই ফোরামে যুক্ত করা হবে বলে জানান। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি সাভারের স্পেকট্রাম, চট্টগ্রামের কেটিএসের দুর্ঘটনা বা পরবর্তীতে ঘটে যাওয়া অন্যান্য দুর্ঘটনাগুলোর সমাধান কীভাবে হতে পারে সে ব্যাপারে এদের কাছ থেকে পরামর্শ পাওয়া যেতে পারে বলে জানান। বাস্তবায়নযোগ্য এমন পরামর্শ দেওয়ার জন্য এই ফোরাম গঠন করা হয়েছে এবং এর একটি টেকনিক্যাল কমিটিও রয়েছে।

সরকারের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি জানান কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবলের সমস্যা নিয়ে সঠিক সেবা পাওয়া যাবেনা মন্তব্য করে তিনি এই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রম বিষয়ে একটি ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে আরেকটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে জানান। টাস্কফোর্সের তৈরি করা চেকলিষ্ট প্রয়োগের জন্য তিনস্তর বিশিষ্ট ডকুমেন্টেশন মোডালিটি তৈরি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে এর কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরে বলেন, কারখানা ও গ্রাউন্ড লেভেল পর্যায়ে একটি করে কমিটি কাজ করবে এবং তাতে মালিক পক্ষ, বিজিএমইএ, সরকার, শ্রমিকসহ সকল পক্ষের প্রতিনিধি থাকবে। কোন কারখানায় শ্রমিক সংগঠন না থাকলেও প্রতিনিধিত্বশীল শ্রমিক প্রতিনিধি সেখানে থাকবে এবং এই চারজনের সমন্বয়ে ছোট্ট একটি কমিটি কাজ করবে। তারা চেকলিষ্ট অনুযায়ী কোনটা কী হওয়া উচিত কী হওয়া উচিত নয় এই বিষয়গুলো তাদের নিজেদের সমিতি বা এসোসিয়েশনের মাধ্যমে রিপোর্ট করতে পারবে। এছাড়া একটা কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল তৈরি করা হচ্ছে যেখানে ইউএনডিপির টেকনিকেল সাপোর্ট নেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান। এর মাধ্যমে শ্রমিক এবং মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি নিয়ে নানা ধরনের উদ্যোগ থাকবে। একই সাথে তারা টাস্কফোর্সের কাজগুলো পাক্ষিক ভিত্তিতে তুলে ধরার চেষ্টা করবে। ফোরাম থেকে ক্রেতাদের সাথে

তথ্য লেনদেনের চেষ্টা চলছে এবং বিজেএমইএ সহ ত্রিপক্ষীয়ভাবে একটি ওয়েবসাইট চালু করা হবে যাতে জনগন গামেন্ট শিল্প সম্পর্কে তথ্য অবাধে জানতে পারে। দুর্ঘটনার কারণে শুধু শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না। পাশাপাশি মালিকসহ পুরো দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি সকল পক্ষের মধ্যে নিয়মিত তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা করতে তার বিভাগ কাজ করে চলেছে বলে মন্তব্য করে আলোচনার সমাপ্তি টানেন।

সুশীল সমাজ কেন?

আলোচনার শেষ পর্যায়ে ড. *ভট্টাচার্য* সুশীল সমাজের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। তিনি সুশীল সমাজের নিজেদের দায়িত্ব পালন না করতে পারাকে একটি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন। তাদের দ্বিধার কারণে দেশে প্রকৃত অর্থেই একটি আত্মঘাতী পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে আমাদের শিল্প একবারেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ কারণে ক্রেতা এবং দাতা গোষ্ঠীদের বলার আগে দেশের নাগরিকদের এই কথাগুলো জোর দিয়ে বলা দরকার বলে তিনি মনে করেন। ড. *ভট্টাচার্য* মন্তব্য করেন, সুশীল সমাজের এখন সময় এসেছে মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠার।

ড. *ওয়াজেদুল ইসলাম* গার্মেন্টস শিল্পের বর্তমান সংকট মোকাবেলায় সুশীল সমাজের যুক্ত হওয়ার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে বলেন, সংলাপে উপস্থিত ব্যক্তিরা দেশের নীতি নির্ধারক বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। তবে তারা আইনের শাসন চায়। সংলাপের মধ্য দিয়ে জাতীয় ভাবে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে একটি কমিটি গঠন করতে পারলে তা থেকে একটি ফলাফল বেরিয়ে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং সুশীল সমাজ নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করে এর কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা দিতে গিয়ে বলেন, এই কমিটি দুর্ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করবেন এবং সরকারকে পরামর্শ দেবে।

সাবেক সংসদ সদস্য *দেলোয়ার হোসেন খান* বলেন, জাতীয় পর্যায়ে একটা স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা পরিদর্শন কমিটি থাকা উচিৎ। ভবিষ্যতে যাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য বিশেষ কমিটি করে সচেতনতা মুলক কর্মসূচি করে এগুলোর সমাধান করতে হবে।

সমাপনী বক্তব্য

ড. *ভট্টাচার্য* সর্বশেষে তার আলোচনার সমাপ্তি টানতে গিয়ে গার্মেন্টস শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সুশীল সমাজের যুক্ত হওয়ার বিষয়ে বলেন, আজকের এ আলোচনা সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হলেও মালিক পক্ষ, শ্রমিক পক্ষ এবং সরকারের বিভিন্ন যে পরিদপ্তর আছে তারা কথা বলেছেন। এ আলোচনা যেন এখানেই শেষ না হয়ে যায় সেদিকে সকল পক্ষেরই দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সিপিডি সুপারিশ মালা তৈরি করবে এবং সরকারের কাছে পৌঁছে দেবে। একটি জাতীয় কমিটি করা যায় কিনা সে প্রশ্নে তিনি বলেন, "এতোখানি আমাদের ক্ষমতা-যোগ্যতা আছে কী না আমরা বিবেচনা করে দেখব। তবে এটি নিঃসন্দেহে সত্য এ বিষয়টি আমাদের মনোযোগের মধ্যে অবশ্যই থাকবে, আগামী কয়েক মাস তো বটেই। আমরা দ্রুত পরিবর্তন দেখতে চাই। স্বল্পমেয়াদে যেগুলো হওয়ার দরকার সেগুলো করা হবে। আর দীর্ঘমেয়াদে যেগুলো হওয়া দরকার, সেগুলোও হবে।"

সভাপতির বক্তব্য

অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার সমাপনী বক্তব্যে গার্মেন্টস শিল্পের জন্য কী করে একটি কমপ্লায়েন্সের ব্যবস্থা করা যায় সে লক্ষ্যে কাজ করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। সুশীল সমাজ, বিজেএমইএ ও শ্রমিক একত্রে কিভাবে তা করতে পারে তার উদাহরণ হিসেবে তিনি প্রতি মাসে কারখানাগুলোতে কতটুকু কমপ্লায়েন্সে আছে, আর ঘাটতি কতটুকু তা পর্যবেক্ষন করে জনসমুখে প্রকাশের পরামর্শ দেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কী করা যাবে, আর কী হয় নাই তা পর্যালোচনার জন্য বলেন তিনি। বিজেএমইএ ও সুশীল সমাজ মিলে একটি একশন কমিটি তৈরি করে তারা একাজে উদ্যোগ ও দায়িত্ব নিতে পারে। কোন কারখানা কমপ্লায়েন্ট হলে তাকে স্বীকৃতি ও না হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। সরকারকেও এর সাথে যুক্ত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করে তিনি এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

(বর্ণানুক্রম অনুসারে)

মিজ নাজমা আক্তার	জেনারেল সেক্রেটারি, আওয়াজ ফাউন্ডেশন
মিজ শিরিন আক্তার	প্রেসিডেন্ট, কর্মজীবী নারী
মিজ সালমা আক্তার	সহকারী ব্যবসা উন্নয়ন উপদেষ্টা, জিটিজেড
জনাব জেড এম কামরুল আনাম	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস ওয়াকার্স লীগ
লে. কর্ণেল এম আনিসুজ্জামান (অব:)	প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলদেশ টেরি টাওয়েল এন্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন
জনাব রুহুল আমিন	জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক টিইউসি
জনাব আমিরুল হক আমিন	জেনারেল সেক্রেটারি, ন্যাশনাল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
মিজ ইসমাত আরা	রিসার্চ অফিসার, কর্মজীবী নারী
জনাব খোরশেদ আলম	নির্বাহী পরিচালক অলটারনেটিভ মুভমেন্ট ফর রিসোর্স এন্ড ফ্রিডম সোসাইটি
জনাব সফিউদ্দিন আহমদ	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
মিজ সেলিমা আহমদ	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ওমেন্স চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ভাইস চেয়ারম্যান, নিটল গ্রুপ
জনাব সিরাজুল ইসলাম রনি	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ
জনাব রবার্ট ওং	পলিটিক্যাল অফিসার, আমেরিকান এম্বাসি
মিজ লায়লা রহমান কবির	মেম্বার, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, এমসিসিআই
জনাব এস এ কাশেম	অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা লিগ্যাল এডভাইজর ও চিফ আরবিট্রেটর, বিজিএমইএ
ড. নাসরিন খন্দকার	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. ফাহমিদা এ খাতুন	সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ
মিজ সৈয়দা মুনিরা খাতুন	সাউথ এশিয়া এলায়েন্স ফর পোভার্টি ইরডিকেশন
ড. ওমর ফারুক খান	সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট এডভাইজর, সিডা
জনাব এ এ মুকিত খান	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস
অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন
মিজ রুনা খান	নির্বাহী পরিচালক, ফ্রেন্ডশীপ
ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান	সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
জনাব রফিকুল ইসলাম খান	পলিসি এনালিস্ট, ইনসিডিন বাংলাদেশ
জনাব এম এ খালেক	উপ পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
জনাব কবির আহমদ চৌধুরী	উপ পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী	জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস
অ্যাডভোকেট আকসির এম চৌধুরী	লিগাল এফায়ারস সেক্রেটারি, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ
ব্যারিস্টার এস কে জেনিফা কে জব্বার	কমপ্লায়েন্স কনসালটেন্ট, বিজিএমইএ
জনাব খন্দকার তুশারুজ্জামান	ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব বিশ্বনাথ দাস	প্রোগ্রাম অফিসার, কর্মজীবী নারী
ড. উত্তম দেব	সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ
জনাব এম এ বারেক	প্রেসিডেন্ট, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট

জনাব এম এ বাসেত	পরিচালক, বিকেএমইএ
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচায	নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি
জনাব স্বপন ভূইয়া	অরগানাইজিং সেক্রেটারি, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন
জনাব লুৎফর রহমান মতিন	প্রক্তন পরিচালক, বিজিএমইএ
জনাব এম এ মমিন	প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
মিজ মোসরেফা মিশু	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম
জনাব ক্রিস্টিয়ান ভন মিটজলাস	পরিচালক, লিফ্‌ট স্ট্যান্ডাড লিঃ
মিজ নাসরিন আউয়াল মিন্টু	প্রেসিডেন্ট, ওমেন এন্ট্রপ্রিনিয়রস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এপারেলস ওয়ার্কাস ফেডারেশন
মিজ চায়না রহমান	জেনারেল সেক্রেটারি, ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কারস
জনাব তসলিমুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট
জনাব সাদেকুর রহমান শামীম	ভাইস প্রেসিডেন্ট, গার্মেন্টস ওয়ার্কার ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
অধ্যাপক রেহমান সোবহান	চেয়ারম্যান, সিপিডি
অধ্যাপক এ এন রাশেদা	শিক্ষক, নটরডেম কলেজ
জনাব মোঃ আহসান রেজা	অ্যাডভোকেসি এণ্ড নেটওয়ার্কিং অফিসার, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
জনাব সেলিম রেজা	প্রেসিডেন্ট, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক লীগ
জনাব জালাল সরদার	মেম্বার, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল
জনাব সালাউদ্দিন স্বপন	প্রেসিডেন্ট, জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
জনাব এস সাজু	গার্মেন্টস শ্রমিক পক্ষ
জনাব মোঃ বাহরাইনে সুলতান	জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক
জনাব আনিসুল হক	প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ ও চেয়ারম্যান, মোহাম্মদী গ্রুপ
জনাব এস এম ফজলুল হক	পরিচালক, বিজিএমইএ ও চেয়ারম্যান, উইনওয়ার লিমিটেড
জনাব মোঃ ফজলুল হক	প্রেসিডেন্ট, বিকেএমইএ
জনাব এম এনামুল হক	প্রোগ্রাম অফিসার, ফ্রেন্ডশিপ
জনাব মোঃ জাফরুল হাসান	জেনারেল সেক্রেটারি, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল ও সেক্রেটারি জেনারেল ইনচার্জ, বিলস
জনাব মোঃ নাহিদুল হাসান (নয়ন)	জেনারেল সেক্রেটারি, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
জনাব দিপু হাসান	নির্বাহী পরিচালক, ইনসিডিন বাংলাদেশ
জনাব মোঃ খালেদ হাসান	ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব আহসান হাবীব	আর্কিটেক্ট, বসতিকল্প
জনাব আবুল হোসেন	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
জনাব কবির হোসেন	সেক্রেটারি-বিলস ও সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি, শ্রমিক দল
জনাব এম দেলওয়ার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন

সাংবাদিকের তালিকা
(বর্ণানুক্রম অনুসারে)

জনাব জুয়েল আনন্দ	বার্তা সম্পাদক, ইএনবি নিউজ
জনাব এ জেড এম আনাস	রিপোর্টার, দ্য ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস
জনাব শওকত আলী	সিনিয়র সাব এডিটর, বাংলদেশ সংবাদ সংস্থা
জনাব মন্‌জুর আহমদ	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো
জনাব সাইদুল আহমদ	রিপোর্টার, দৈনিক ভোরের ডাক
জনাব হাবিব ইমরান	জুনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক যায় যায় দিন
জনাব সফিকুল ইসলাম	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমাদের সময়
জনাব মো: মঞ্জুরুল ইসলাম	স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ(এন এন বি)
জনাব আরিফুল ইসলাম	ক্যামেরাম্যান, চ্যানেল আই
জনাব তপন খান	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দি ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট
জনাব আবদুর রহমান খান	রিপোর্টার, দৈনিক দেশ বাংলা
জনাব মিজান চৌধুরী	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ
মিজ তানিয়া তুন নাছ	রিপোর্টার, দৈনিক যায়যায় দিন
মিজ আংগুর নাহার মন্টি	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ভোরের কাগজ
জনাব মামুন	ক্যামেরা ম্যান, এসটিভিইউএস
জনাব হাসান মাসুদ	প্রতিনিধি, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস
জনাব দেওয়ান হানিফ মাহমুদ	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল
মিজ সুলতানা রহমান	স্টাফ রিপোর্টার, এনটিভি
জনাব পিনাকী রায়	স্টাফ রিপোর্টার, দ্য ডেইলি স্টার
জনাব গোলাম কাদির রাবু	রিপোর্টার, এসটিভিইউএস
জনাব সাদিক রহিম	সিনিয়র রিপোর্টার, দি বিজনেস বাংলাদেশ
জনাব সোহান সানোয়ার	রিপোর্টার, দি এক্সিকিউটিভ টাইম্‌স
জনাব কাজী সোহাগ	স্টাফ রিপোর্টার, দ্য ডেইলি স্টার
মিজ সান্তা সুলতানা	রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ
জনাব ইলিয়াস হোসেন	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমাদের সময়
জনাব বেলায়েত হোসেন	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক দিনকাল
জনাব মামুন হোসেন	রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর
জনাব জাকির হোসেন	রিপোর্টার, দৈনিক খবরপত্র